নীলদর্পণ : নামকরণ

সাহিত্যে নামকরণ সবসময়ও গুরুত্বপূর্ন। কারণ নামকরনের মধ্যে দিয়ে ঐ সাহিত্যকর্মের সারসত্তার সন্ধান মেলে। অন্তত তার একটা আভাস মেলে। নাটকের ক্ষেত্রেও তার ব্যাতিক্রম নয় । 'নীলদর্পণ' নাটকটির নামকরণের মধ্যে দিয়ে নাট্যকারের মনোভাব পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই আন্দাজ করে নেন। 'নীলদর্পণ' এর দর্পন শব্দটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই নাটকের ভূমিকার দিকে নজর করলে দেখা যায়, নাট্যকার বলেছেন -

"নীলকরনিকরকরে নীল দর্পন অর্পন করিলাম। এক্ষনে তাঁহারা

নিজ নিজ মুখ সন্দর্শন পূর্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা -কলঙ্ক - তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পরোপকার শ্বেতচন্দন ধারণ করুণ, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ রক্ষা।....."

এই বক্তব্যেই 'দর্পণ' শব্দের মুল অর্থ প্রকাশিত । নিজ নিজ মুখ সন্দর্শনপূর্বক' এই শব্দবন্ধেই বলে দেওয়া হয়েছে আসল কথা। ইংরেজ নীলকরেরা নিজেদের অত্যাচারের কাহিনী, কুকর্ম এই নাটক রূপ দর্পণে দেখে বুঝুক তারা কি মহাপাতকের কাজ করেছে। এই নাটক আসলে তাদের প্রতিবিম্ব স্বরূপ।

এই 'দর্পণ' শব্দটির নানান অর্থব্যঞ্জনা। সে সময়ের কিছু সংবাদপত্রের নাম 'দর্পণ' দিয়ে ছিল । যেমন -'সমাচার জ্ঞানদর্পণ' 'মহাজনদর্পণ', 'বিদ্যাদর্পণ' ইত্যাদি। শুধু তাই নয় সে সময়ের সেই সংবাদ পত্রগুলিতে নীতিবাক্য বা আদর্শবাণী থাকতো যাতে তার নিজস্ব চরিত্রটি ধরা পড়ত। 'নীলদর্পণ' এও নাট্যকার সে পথ অনুসরণ করে লিখেছেন -

"নীলদর্পণং নাটকং নীলকর বিষধর-দংশন কাতর - প্রজানিকর ক্ষেমঙ্করেন কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতং"

সাময়িক পত্র যেমন সংবাদে প্রকৃত দর্পণ, তেমনি 'নীলদর্পণ' ও যেন নীলকরদের অত্যাচারের দর্পণ। এই অর্থে 'দর্পণ' সেখান থেকেই 'নীলদর্পণ' এই দর্পণে যারামুখ দেখবন তারা ইংরেজ,, বিজাতীয় । এদেশের তারা কেউ নয় । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই কারণেই নাটকটি অনুবাদ করা হয়। তবে যাই হোক এই বিদেশী দুই ধরনের - অত্যাচারী, দুবৃত্ত নীলকর সাহেবরা আর দ্বিতীয় শ্রেণী মানবতাবাদী ভালো ইংরেজরা। এই ভালো ইংরেজদেরকেই এ দর্পণ সমর্পণ করেছেন নাট্যকার। সে কারনে অত্যাচারের নিখুঁত চিত্র চাই । সেই চিত্র ; প্রতিবিম্ব দেখে যেন তারা নিজেরাই লজ্জিত হয়। তাদের শুভবোধ জাগ্রত হয়। এটিই ছিল নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য।

এছাড়া নাটকে উল্লিখিত প্রজাদের সংলাপ থেকে বোঝা যায়, নীলচাষের সম্পূর্ন্য বিলুপ্তি নয়, প্রজাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার বন্ধ করাই নাট্যকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সেই কারণে দীনবন্ধু চরিত্রদের মুখ দিয়ে বারে বারে বলিয়েছেন গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার কথা প্রজারাই যদি গ্রাম ছেড়ে চলে যায়, তাহলে নীলচাষ করবে কারা। অতএব, ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থেই প্রজাপীড়ন বন্ধ করুক - এমনই বার্তা কৌশলে নাট্যকার দেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে সাধুচরণের মুখে শোনা যায় দক্ষিণ পাড়ার মোড়লের নীলকরদের অত্যাচারে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল।

"..... ধানের ভুঁয়ে নীল করেনি বল্যে মেজো সেজো দুই ভাইকে ধরে সাহেব বেটা বৎসর কি মারটিই মেরেছিল ; উহাদের খালাস কর্য্যে আন্তে কত কষ্ট, হাল গোরু বিক্রি হয়ে যায়। ঐ চোটেই দুই মোড়ল গাঁছাড়া হয়।" (১/১)

আরেকটি দিকও নাটকে উঠে আসে তা হল দেশীয় জমিদার নীল কর্মচারীদের নিষ্ঠুরতার - হিংস্রতা। বিদেশী নীলকরদের মত এরাও সমান ভাবে অত্যাচারী, দোষী। বরং এরা না থাকলে গ্রামের প্রজাদের সম্বন্ধে সাহেবদের কাছে কোন তথ্য যেতনা। সেদিক থেকে এরা খানিক বেশিই ছিল অত্যাচারী। নাট্যকার এখানে ভারী চমৎকার কৌশল নিয়েছেন। ইংরেজ নীলকরদের দোষ দেখানো হয়েচে গোপীর দৃষ্টিতে আর ভারতীয় নীলকরদের দোষ দেখানো হয়েছে উডের দৃষ্টিতে। এই দুই শ্রেণী ছাড়া আর একটি শ্রেণী হল দেশীয় মহাজনেরা। এরা টাকা ধার দিয়ে তেজারতি করে। এই শ্রেণীটি যে কতটা হিংস্র, উডের প্রশ্নের উত্তরে এক উমেদার যা জানা যায় তা থেকে স্পষ্ট -

"..... রাইয়তেরা বলে নীলকর সাহেবদের দৌলতে মহাজনের হাত হইতে রক্ষা পাইতেছি।" (৫/১)

কাজেই সর্বার্থেই এ নাটক নীলচাষের দর্পণ।